আনন্দবাজার পত্রিকা
অনলাইন সংস্করণ

অহিংস প্রতিবাদই পথ

বাক্‌স্বাধীনতার পথ বন্ধ করে স্বৈরতন্ত্রের পথে চলেছে ভারত

অমর্ত্য সেন অমর্ত্য সেন ৩ নভেম্বর, ২০২০

দেশদ্রোহ? জাতীয় নাগরিকপঞ্জির বিরুদ্ধে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক প্রতিবাদসভায় উমর খালিদ। ১৩ জানুয়ারি, ২০২০

দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট মনে করতেন ‘জনপরিসরে সমস্ত বিষয়ে লোকের বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করার স্বাধীনতা’-র চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না। অথচ, প্রায়শই সমাজে মতামত প্রকাশের সুযোগগুলোকে চেপে দেওয়া হয়। আজকের পৃথিবীতে এশিয়া, ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে, এবং খাস আমেরিকাতে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন বলীয়ান হয়ে উঠছে, এটা একটা প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার কারণ। আমার স্বদেশ ভারতকে এই তালিকা থেকে বাদ রাখতে পারছি না।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর ভারত বহু দশক ধরে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের এক চমৎকার ঐতিহ্য বহন করে এসেছে। ভারতবাসীরা স্বাধীনতার প্রতি তাঁদের জোরালো দায়বদ্ধতার প্রমাণ দিয়ে প্রবল গণসক্রিয়তার মধ্য দিয়ে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়েছেন। যেমন ‘জরুরি অবস্থা’র নাম করে চলতে থাকা স্বৈরাচারী শাসনকে ১৯৭৭ সালে তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে খারিজ করেন। সরকার পত্রপাঠ মানুষের এই রায় থেকে শিক্ষা নেয়।

কিন্তু সম্প্রতি অনেকের কাছে স্বাধীনতা যেন তার দীপ্তি হারিয়েছে। এখনকার সরকার যে একটা অন্য রকম সমাজ নিয়ে আসতে বদ্ধপরিকর, তাদের কার্যকলাপে সেটা বিলক্ষণ প্রমাণিত। আশ্চর্যের ব্যাপার, সরকার-বিরোধী প্রতিবাদগুলোকে ‘দেশদ্রোহ’ বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এবং তেমন প্রতিবাদকে পিষে মারার জন্য দেশদ্রোহিতার অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে বিরোধীদের জেলে পোরা হচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে স্বৈরতান্ত্রিক ভাবনা তো আছেই, সেই সঙ্গে একটা মস্ত বিভ্রান্তিও আছে: সরকারের মতের সঙ্গে না মিললেই সেটাকে রাষ্ট্রকে উৎখাত করার জন্য কিংবা জাতিকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য বিদ্রোহ হিসেবে, অর্থাৎ দেশদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করে দেওয়া।

আমি যখন স্কুলে পড়তাম, ভারত তখন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে। সেই সময় আমার অনেক আত্মীয় মহাত্মা গাঁধী ও অন্য নেতাদের প্রেরণায় অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁরা যাতে কোনও হিংসাত্মক কাণ্ড ঘটাতে না পারেন, এই অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার তাঁদের ‘নিবর্তনমূলক আটক’ আইনে গ্রেফতার করে। স্বাধীনতার পর এই আইন প্রত্যাহার করা হয়েছিল, কিন্তু কিছু কাল পরে কংগ্রেস সরকার তাকে ফেরত আনে, যদিও তুলনায় নরম আকারে। সেটাই রীতিমতো নিন্দনীয় ছিল, কিন্তু হিন্দুত্ববাদী বিজেপি জমানায় নিবর্তনমূলক আটক আইন বড় আকারে দেখা দিয়েছে, তাকে কাজে

লাগিয়ে যাকে যখন খুশি গ্রেফতার করা হচ্ছে এবং বিরোধী নেতাদের বিনা বিচারে জেলে পুরে রাখা হচ্ছে।

বস্তুত, গত বছর থেকে সংশোধিত বেআইনি কার্যকলাপ (নিবারণ) আইন (ইউএপিএ) ব্যবহার করে রাষ্ট্র একতরফা ভাবে যে কোনও ব্যক্তিকে সন্ত্রাসবাদী বলে ঘোষণা করে দিতে পারে এবং তাঁকে বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখতে পারে। এই আইনের বলে অনেক মানবাধিকার কর্মীকে সন্ত্রাসবাদী বলে দাগিয়ে দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে।

কাউকে 'দেশ-বিরোধী' (অ্যান্টি-ন্যাশনাল) বললে পৃথিবীর যে কোনও দেশেই সেটা একটা বড় রকমের মতাদর্শগত নিন্দাবাদ বলে গণ্য হয়। কিন্তু আজকের ভারতে কেউ সরকারের সমালোচনা করলেই তাঁর গায়ে 'দেশ-বিরোধী' ছাপ লাগিয়ে দেওয়া হতে পারে। 'সরকার-বিরোধিতা' ও 'দেশ-বিরোধিতা'র মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু স্বৈরশাসনে সচরাচর এই ফারাকটাকে গুলিয়ে দেওয়া হয়। ক্ষমতার এমন অপব্যবহার আটকানোর ব্যাপারে আদালত কখনও কখনও কিছু কিছু ভূমিকা নিয়েছে, কিন্তু ভারতীয় বিচারব্যবস্থার শ্লথগতি এবং সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের ভিতরে বিভিন্ন ব্যাপারে মতপার্থক্যের কারণে, এই ভূমিকা সর্বদা যথেষ্ট কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি। বিশ্বের অন্যতম অগ্রণী মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে সরকারি তৎপরতায় ভারত ছাড়তে বাধ্য করা হল।

সাধারণত দেখা যায়, স্বৈরতন্ত্রে সমাজের একটা বিশেষ অংশের উপর নিপীড়ন চালানো হয়। ভারতে এই নিপীড়ন সচরাচর চলে বিশেষ জাতি বা ধর্মের লোকেদের ওপর। আগে যাঁদের 'অচ্ছুত' বলা হত এবং এখন 'দলিত' বলা হয়, সেই নিম্নবর্ণের লোকেরা চাকরি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরে চালু হওয়া সংরক্ষণের সুবিধা পান ঠিকই, কিন্তু সমাজে তাঁদের প্রায়শই ভয়ানক দুর্ব্যবহারের শিকার হতে হয়। ইদানীং এক দিকে উচ্চবর্ণের লোকেদের দ্বারা দলিতদের ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা ব্যাপক ভাবে বেড়ে চলেছে, অন্য দিকে সরকারের পক্ষ থেকে এগুলোকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টাও খুব বেশি দেখা যাচ্ছে। একমাত্র জোরালো গণবিক্ষোভের চাপেই এগুলো কিছুটা প্রকাশ্যে আসে।

ভারত সরকারের কর্তাব্যক্তিরা মুসলমানদের অধিকার হননের ব্যাপারে অতিমাত্রায় তৎপর— এতটাই যে, তাঁদের কিছু কিছু নাগরিক অধিকারও ছেঁটে ফেলার চেষ্টা চলছে। এ-দেশে হিন্দু এবং মুসলমানরা শত শত বছর ধরে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করে এসেছেন। কিন্তু ইদানীং রাজনৈতিক ভাবে চরমপন্থী হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর আচরণে এ-দেশীয় মুসলমানদের বিদেশি হিসেবে গণ্য করার চেষ্টা প্রকট হয়ে উঠেছে। তারা এমন দোষারোপও করছে যে, মুসলমানরা দেশের ক্ষতি করে চলেছেন। চরমপন্থী হিন্দু রাজনীতির ক্রমবর্ধমান শক্তি এতে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে, এবং এর ফলে সমাজে ধর্মাশ্রিত বৈর-ভাব ও গোষ্ঠীগত বিচ্ছিন্নতা বিপুল ভাবে বাড়ছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যেতে পারে, পারিবারিক ভাবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন হিন্দু। কিন্তু তিনি যখন অক্সফোর্ডে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় বলেন যে, তিনি এসেছেন হিন্দু, মুসলমান ও পশ্চিমি প্রভাব— এই তিন ধারার সঙ্গম থেকে, তখন তাঁর হিন্দু পরিচিতির সঙ্গে এই সমন্বিত পরিচিতির কোনও সংঘাত ঘটে না।

ভারতীয় সংস্কৃতি হল নানা ধর্মের লোকেদের যৌথ সাধনার ফল। সঙ্গীত বা সাহিত্য থেকে চিত্রকলা ও স্থাপত্য পর্যন্ত নানা ক্ষেত্রে এই সমন্বয়ের দেখা মেলে। এমনকি, ভারতের বাইরের লোকেরা যাতে পড়তে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে উপনিষদের মতো হিন্দু শাস্ত্রগুলোর তর্জমার কাজটি শুরু করেন দারা শুকো— সম্রাজ্ঞী মুমতাজের জ্যেষ্ঠপুত্র, যে মুমতাজের স্মৃতিতে তাজমহল নির্মাণ করিয়েছিলেন সম্রাট শাহজাহান। অথচ বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বহু স্কুলপাঠ্য বইতে এমন আদ্যন্ত মনগড়া ইতিহাস পরিবেশিত হচ্ছে, যেগুলোতে মুসলমানদের অবদানকে হয় ঢেকে দেওয়া হচ্ছে বা সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া হচ্ছে।

ইউএপিএ-র বলে বলীয়ান সরকার যাকে খুশি সন্ত্রাসবাদী বানিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু অন্য পক্ষে যাঁদের অভিযুক্ত করা হচ্ছে তাঁরা প্রতিবাদের পথ হিসেবে সাধারণত গাঁধী-প্রবর্তিত অহিংস ধারাটিকেই অনুসরণ করছেন। এটা বিশেষ করে ঘটে চলেছে নতুন ভাবে উঠে আসা, বিশেষত ছাত্রদের দ্বারা সংগঠিত, ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান গবেষক ছাত্র উমর খালিদের কথাই ধরা যাক। উমরকে ইউএপিএ আইনে ‘সন্ত্রাসবাদী’ বলে দেগে দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং জেলে পুরে রাখা হয়েছে। কিন্তু উমর এই আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ দিকটিকে

চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেছেন: “ওরা আমাদের লাঠিপেটা করলে আমরা তেরঙ্গা ওড়াব। ওদের বুলেটের জবাবে আমরা হাতে ধরে রাখা সংবিধানকে উপরে তুলে ধরব।”

ভারতের ক্রমবর্ধমান স্বৈরাচার আটকাবার জন্য যখন দৃঢ় প্রতিরোধের প্রয়োজন, বিশ্ব জুড়েই তখন স্বৈরশাসনের বাড়বাড়ন্ত। এর ফলে ভারতের স্বৈরাচারী চেহারাটা যতখানি উৎকট, ঠিক ততখানি ধরা পড়ছে না। মানুষের উপর অত্যাচারের জন্য দেওয়া অজুহাত দেশে দেশে আলাদা আলাদা হয়: ফিলিপিন্স-এ মাদক চোরাচালান বন্ধ করা, হাঙ্গেরিতে অভিবাসীদের আটকানো, পোল্যান্ডে সমকামী জীবনযাত্রা দমন করা, এবং ব্রাজিলে তথাকথিত দুর্নীতির প্রতিকার করার জন্য সেনাবাহিনীকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া। পৃথিবীতে মানুষের স্বাধীনতার উপর বিভিন্ন রকমের আক্রমণ আসছে, সেগুলোর প্রতিরোধের পথও হবে বিভিন্ন।

১৯৬৩ সালে বার্মিংহাম জেলে বসে লেখা এক চিঠিতে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বলেছিলেন: “অন্যায় যেখানেই ঘটুক না কেন, তা সর্বত্র ন্যায্যতাকে বিপন্ন করে।” তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, সব প্রতিরোধকে অহিংস হতে হবে। আজকের ভারতের ছাত্রনেতারাও তা-ই বলছেন। পৃথিবীর নানা স্বৈরশাসনের মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে— তেমনই সেগুলোর প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও কাজ করে এক সাধারণ যুক্তিবিচার।

(জার্মান বুক ট্রেড-এর দেওয়া শান্তি পুরস্কার (২০২০) উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার নির্বাচিত অংশ।)